ঠাকুরবাড়ি সংক্রান্ত

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : অন্ধকারে উৎসারিত আলো	১১
ঠাকুরবাড়ির বিজ্ঞান-ভাবনা	২৮
ঠাকুরবাড়ির এক বিদেশি বধূ	৪০
সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলির প্রথম প্রকাশক	৫১
ছোটোদের জোড়াসাঁকো	৫৯
মাধুর্যময় এক সম্পর্ক : রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ	৭৪
রবীন্দ্র-জামাতা নগেন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্যের বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব	৮৪
অবনীন্দ্রনাথ, মোহনলাল ও চিঠির গল্প	৯৩
অবনীন্দ্রনাথ : যাত্রার আসরে নিঃসঙ্গ পথিক	১০২
অবনীন্দ্রনাথের অন্য ভুবন	১১২
কবির প্রিয় বন্ধু : প্রিয়নাথ সেন	১২৬
রবীন্দ্র-গল্প প্রসঙ্গে দু'চার কথা	১৩৪
চোখের বালি : পূর্বপ্রস্তুতিহীন 'আকস্মিক' নয়	১৪৬
মঞ্চে বিসর্জন : কালে কালান্তরে	১৫৮
শারদোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ	১৭১
রবীন্দ্রনাথের ছড়া 'সচেতনতার ঐশ্বর্য'	১৮০
আড়ালে থাকা 'ছুটির পড়া'-র নিঃশব্দে একশো বছর	১৯৭
কবিকণ্ঠের ইতিবৃত্ত	২০৩

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : অন্ধকারে উৎসারিত আলো

পরিবার থেকে সমাজজীবন—অশিক্ষার অন্ধকার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছড়িয়ে ছিল সর্বত্র। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা সাগরপারের মানুষ এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও আরও কয়েকজন পরম আন্তরিকতায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের আন্তরিকতায় কোনো খাদ ছিল না। সেই আন্তরিক প্রয়াসে সহসা অশিক্ষার অন্ধকার ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল, অন্ধকার পেরিয়ে তখুনি আলোকিত প্রভাতে পৌঁছানো গিয়েছিল, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বাস্তব বড়ো নির্মম, কঠিনও। সহসা নয়, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিরন্তর-নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ ও উদ্যমের ফলে সেই অন্ধকার অতি ধীর লয়ে ফিকে হয়েছে।

বঙ্গনারীকে আধুনিকতার অভিমুখ কে চিনিয়েছে? মনে হওয়াই স্বাভাবিক, পুরুষশাসিত সমাজে নারী-অবদমনের যথেচ্ছ পরিকল্পনা যেমন চলেছে, তেমনই সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও কয়েকজন পুরুষের চেষ্টাতেই নারীসমাজ আলোকিত হয়েছিল। সংস্কারের বেড়াজাল তছনছ করে, লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করে কেউ কেউ প্রায় 'ত্রাতা'-র ভূমিকা নিয়েছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি নারীরও ভূমিকা ছিল। দুহাতে অন্ধকার সরিয়ে নারীও আলোকিত অঙ্গনে পৌঁছোনোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। রাসসুন্দরীর আত্মকথনে রয়েছে খেদোক্তি, 'আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছে? আমার জীবন ধিক।' নিজের প্রতি ধিক্কার বর্ষণ করে কাজের কাজ কতটুকু হয়, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনতর চিন্তাভাবনায় মনের কোণে অবসাদই শুধু জমে।

সব থেকে বড়ো কথা, সমাজের অর্থহীন বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে সে সময় মেয়েরাও কেউ কেউ আলোর পথে হাঁটতে চেয়েছিল। নিজেদের গড়েছিল তারা। এই গড়ার কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। সমাজের অনুশাসন না মানলে সমাজপতিরাই বা ছেড়ে দেবে কেন! নানাভাবে সামনে বাধার প্রাচীর তুলেছে! চলার পথ কণ্টকিত করেছে। আর চোখরাঙানি তো ছিলই। যাবতীয়

প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয়যুক্ত হয়েছে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। নবজাগরণের আলোয় আলোকিত এই ব্যতিক্রমী পরিবারটি আমাদের পথ দেখিয়েছে। শুধু সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে নয়, জীবনের সর্বস্তরেই পথ প্রদর্শক। নতুনতর চিন্তাধারায় উদ্দীপিত ঠাকুরপরিবারে যে আধুনিকতার আলো দেখা গিয়েছিল, তা জোড়াসাঁকোর চার দেয়ালের মধ্যে ঘুরপাক খায়নি, ছড়িয়ে পড়েছে বৃহত্তর সমাজজীবনে। মানুষ প্রাণিত হয়েছে, ঘরে বাইরে কোণঠাসা নারীর কাছে ঠাকুরপরিবার হয়ে উঠেছে প্রেরণার কেন্দ্রস্থল।

আধুনিকতার বার্তাবহ ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহলের অধিবাসিনীদের কেউ বিজ্ঞান-ভাবনায় ভাবিত হয়ে ছোটোদের জন্য 'বালক' পত্রে লিখেছেন প্রবন্ধ, কেউ আরবি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন গড়ের মাঠে, কেউ বা অদম্য মনোবলে, প্রায়-দুঃসাহসিনী হয়ে শিশুসন্তানদের সঙ্গে নিয়ে একাকিনী সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছেন বিলেতে।

ঠাকুর পরিবার যেমন নারীসমাজের প্রেরণাস্থল হয়ে উঠেছিল, তেমনই ওই পরিবারের অন্দরমহল-অধিবাসিনীদের, বধূ-কন্যাদের প্রধান প্রেরণাস্থলে ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। প্রাণরসে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি। নারী আজ পেয়েছে ভাগ্যজয়ের অধিকার। আকস্মিক তা মেলেনি। আড়ালে রয়েছে অশ্রুজল, বেদনার ইতিহাস। এই ইতিহাস একক প্রয়াসে রচিত হয়নি, অনেকেরই ভূমিকা রয়েছে। ঠাকুরবাড়ির বধূ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ভূমিকা প্রকৃতই অবিস্মরণীয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিস্তারে, নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সক্রিয়তা এক চিরকালীন দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। নারীকে জাগরিত রাখার জন্য, নারীকে আলোকিত করার জন্য জ্ঞানদানন্দিনী পথে নামেননি কখনও। নিজের আচার-আচরণ ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্ত্রী-স্বাধীনতার মাধুর্য। অশিক্ষা ও সংস্কারের অন্ধকার দূর হয়ে যাক, আসুক আলো—এই বোধ ও ভাবনা নিজের দিনযাপনের মধ্য দিয়ে পরিবারে তো বটেই, বৃহত্তর নারীমনেও সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। একাজে সব সময়ই তিনি পাশে পেয়েছেন স্বামী সত্যেন্দ্রনাথকে। পারিবারিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা। তাঁর

চিন্তা-ভাবনায় কোনোকালেই দীনতা-সংকীর্ণতা ছিল না। 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' নামে তিনি যে বইটি লিখেছিলেন, সে বইতে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী।' চিন্তার এই ঔদার্য আরও বেড়েছে, পূর্ণতা লাভ করেছে বিলেতে বাসকালে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সত্যেন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনের আলো-অন্ধকার। মেমজীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেননি বঙ্গের মহিলাজীবনের ফারাক। বইটি থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, 'বিলেত গিয়ে আমি দেখতুম স্ত্রী পুরুষ কেমন স্বাধীনভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশা করছে। গার্হস্থ্য জীবনে তাদের মেয়েদের কি মোহনসুন্দর প্রভাব। কত বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণী সমাজের বিবিধ মঙ্গলব্রতে জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছেন।...তাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীরা পর্দার অন্ধকারে কী খর্বীকৃত বদ্ধ জীবন যাপন করেন,—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সংকীর্ণ—তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া কিছুই স্ফূর্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বিষয়ে পূর্বপশ্চিমের পরস্পর বিপরীতভাব আমাদের মনে স্পষ্ট প্রতিভাত হল—পর্দা উচ্ছেদ-স্পৃহা আরও জেগে উঠল।'

চিন্তায় চেতনায় শুধু নয়, মেরি কার্পেন্টারের পরামর্শে একাজে সত্যেন্দ্রনাথ কতখানি এগিয়েছিলেন, সে সাক্ষ্য রয়েছে স্মৃতিচর্চায়। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষের কথায় প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে নারীজাগরণকল্পে মেরি কার্পেন্টার এদেশে এসেওছিলেন।

যশোরের নরেন্দ্রপুর গ্রামের অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ও নিস্তারিণী দেবীর কন্যা জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরবাড়িতে বধূ হয়ে আসেন ১৮৫৭তে, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। তখন তাঁর বয়স (জন্ম ২৬ জুলাই ১৮৫০) সবে সাত পেরিয়েছে। নিতান্তই বালিকা তিনি। ঠাকুরবাড়িতে আসার পর তাঁর দুধের দাঁত পড়া শেষ হয়েছিল। দাঁত পড়া শুরু হয়েছিল যশোরে। বিবাহসূত্রে শহর কলকাতায় আসার পরও তা অব্যাহত ছিল। দুধের দাঁত পড়ে নতুন দাঁত উঠেছিল। পড়ে যাওয়া দাঁতটি গর্তে ফেলে, 'তোমার দাঁত আমায় দাও'—ইঁদুরের উদ্দেশে আর্জি জানানো গ্রামের বাড়িতে সহজসাধ্য ছিল। বিয়ের পর শহরে, কংক্রিটের বাড়িতে পড়লেন ঘোরতর বিপদে। জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন, 'বিয়ের পরে যখন বাকি দুধের দাঁতগুলি পড়ত তখন কলকাতার সেই পাকা ইটচুনের বাড়িতে দাঁত ফেলতে ইঁদুরের গর্ত কোথায় খুঁজব তা ভেবে পেতুম না।'

বালিকাবধূর লেখাপড়া নিয়ে বিলেতে বসবাসকালে সত্যেন্দ্রনাথ কতখানি উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, তা ধরা পড়েছে পত্নীর উদ্দেশে দূর প্রবাস থেকে লেখা বহু

পত্রে। লেখাপড়া শিখে চিন্তায় চেতনায় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক জ্ঞানদানন্দিনী, তাঁর 'জ্ঞেনুমণি', এমনটিই চেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া অবশ্য ছিল। ঠাকুরবাড়িতে ঢের আগেই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সদিচ্ছায় নববধূর বিদ্যাচর্চার প্রবর্তন, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। মহর্ষিপত্নী সারদাসুন্দরীর গ্রন্থপ্রীতির কথা কন্যা স্বর্ণকুমারীর লেখায় রয়েছে, রয়েছে পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের বিদ্যাচর্চার কথা। 'প্রদীপ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩০৬-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, 'আহার বিরাম পূজা অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। ...আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতা ঠাকুরানী ত কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন।'

স্বর্ণকুমারীর (জন্ম ১৮৫৬) থেকে প্রায় নয় বছরের বড়ো মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী। 'প্রবাসী'র ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮ সংখ্যা দুটিতে সৌদামিনী লিখেছিলেন 'পিতৃস্মৃতি'। সেই স্মৃতিচর্চায় রয়েছে, 'আমাদের প্রথম শিক্ষা একজন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম এবং কলাপাতে চিঠিলেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল।' সৌদামিনীর লেখা থেকেই জানা যায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহর্ষি তাঁকে ও তাঁর 'খুড়তুতো ভগিনী'কে সে-স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী ও সৌদামিনীর রচনা থেকে অন্তত এইটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্য ঠাকুরবাড়িতে প্রথম বিদ্যাচর্চার শুরু হয়নি। স্বর্ণকুমারী-সৌদামিনীর কালেও যেমন বিদ্যাচর্চা ছিল, তেমনই ছিল সারদাসুন্দরীর কালেও। শ্বশুরালয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিদ্যাচর্চা অব্যাহত ছিল মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে। মেডিকেল কলেজে কিছুকাল পড়েছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। ছিলেন মুক্তমনের, মুক্তচিন্তার অধিকারী। অত্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাও লিখতেন নিয়মিত। ডাক্তারি পড়ায় মাঝপথে ছেদ পড়লেও হেমেন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষার প্রতি আগ্রহে কখনও ছেদ পড়েনি। ছোটোদের পড়াতে ভালোবাসতেন, অফুরান আগ্রহ ও ধৈর্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ শৈশব-বাল্যে তাঁর 'সেজদাদা'র কাছেই বিদ্যানুশীলন করেছেন। বাড়ির

বালক-বালিকাদের পাশাপাশি বধূমাতাকে পড়ানোর দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিচর্চায় রয়েছে সে-বিবরণ, 'আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম।' শ্বশুরালয়ে এসেই জ্ঞানদানন্দিনীর হাতেখড়ি হয়েছে, লিখতে পড়তে শিখেছেন, তা নয়। পিতৃগৃহেই তাঁর বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই জানিয়েছেন, 'আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমার বাবামশায় একটা পাঠশালা খুলেছিলেন সেখানে মুসলমান পর্যন্ত বড়ো বড়ো ছেলেরা যেত ; কেবল আমি একলা ছোটো মেয়ে ছিলুম।'

জ্ঞানদানন্দিনীর মা নিস্তারিণী দেবী সামাজিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। কতখানি প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর লেখাপড়ার চর্চা চলেছিল, সে চিত্র রয়েছে জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিচর্চায়। একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'সে সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড়ো নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি যে আমার মা কি লিখছেন না পড়ছেন, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেগুলো সব ঢেকে ফেললেন, পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি।'

পিতৃগৃহে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর যে বিদ্যাচর্চার শুরু, তা নিঃসন্দেহে শ্বশুরালয়ে আরও ব্যাপ্তি পেয়েছিল। বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে খানিক, স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও আলাপচারিতায় আরও খানিক, ক্রমেই জ্ঞানদানন্দিনীর মনের বন্ধ দরজা-জানলা খুলে গিয়েছিল। চিন্তার স্বচ্ছতায়, প্রগতিশীলতায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ক্রমেই হয়ে উঠেছেন মহীয়সী। যুগের থেকে অনেক অনেক এগিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আলোকবর্তিকায় আলোকিত করেছিল সমাজ, বিশেষত পর্দানশিন নারীকূল।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রয়াত হন ১৯২৩-এ। তাঁর মৃত্যুর পর 'ভারতী'র পাতায় (মাঘ, ১৩২৯) তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সৌরীন্দ্রমোহনের লেখা থেকে জানা যায়, 'সাহেবিয়ানার সেই প্রথম যুগে যখন বাংলা বলিতে বাংলা লিখিতে শিক্ষিত বাঙালি লজ্জায় মরিয়া যাইত, বেশে-ভূষায়, আদবে-কায়দায় সাহেব বলিতে বাঙালি যখন আত্মহারা উন্মাদ, সেই সাহেবিয়ানার বিরাট ধূমধামের মাঝে বিলাত-ফেরত সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ সে মোহের আবর্তে পড়েন নাই। আচারে বিচারে তিনি বাঙালি ছিলেন, স্বদেশি ছিলেন। তাঁর অন্তরে বিলাত আর রাংতার ছোপ লাগাইতে পারে নাই।'

এই স্বাদেশিকতাবোধ ও বাঙালিয়ানা জ্ঞানদানন্দিনীর মধ্যেও চির জাগরুক ছিল। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর জীবনে অপরিমেয়। সত্যেন্দ্রনাথ কর্মসূত্রে